গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৭ বর্ষ ৪০ সংখ্যা ২৯ মে - ৪ জুন, ২০১৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

মোদি সরকারের এক বছর

‘আচ্ছে দিন’ নির্মম পরিহাসে পরিণত

সংসদীয় দলের বৈঠক চলছিল। প্রধানমন্ত্রী গম্ভীর মুখে বোঝাচ্ছিলেন সাংসদদের। সরকারের সাফল্যগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে, তাদের কাছে গিয়ে বোঝাতে হবে সরকার তাদের জন্য কী কী করছে। হঠাৎই একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর দিকে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, দিল্লি থেকে প্রকল্প ঘোষণা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবের জমিতে তো তার প্রতিফলন নেই। আমরা জনসাধারণের সামনে গিয়ে তা হলে কী বলব? থতমত খেয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রশ্ন করেছিলেন দলেরই উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার সাংসদ ভরত সিংহ।

বাস্তবিক ঐ সাংসদের বক্তব্যে গত এক বছরে মোদি সরকারের কাজের যেন এক পরিষ্কার চিত্র উঠে এসেছে। এই সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা যত গর্জন করেছেন, বাস্তবের মাটিতে বর্ষণ তার ছিটেফোঁটাও হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই জনজীবনের সমস্ত মহল থেকেই আজ আঙুল উঠছে সরকারের বিরুদ্ধে। প্রতিশ্রুতির যে বেলুনকে ফোলাতে ফোলাতে বিরাট আকার দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী, বছর শেষে তা একেবারে চুপসে গেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত এবং প্রতারিত হতে থাকা সাধারণ মানুষের একাংশ নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী বাকচাতুর্যে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ তো আশাশূন্য হয়ে বা শুধুমাত্র হতাশাকে সম্বল করে বাঁচতে পারে না। বারবার প্রতারিত হয়েও নিরুপায় মানুষকে আবার নতুন আশায় বুক বাঁধতে হয়। বঞ্চিত মানুষের এই মনস্তত্ত্বকেই ধূর্ততার সাথে কাজে লাগিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দল বিজেপি। আর বিপুল পরিমাণ টাকার থলির শক্তি নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়েছিল দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতির দল। কাজে লাগিয়েছিল গোটা প্রচারমাধ্যমকে। কিন্তু কথার জাদুতে, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে মানুষকে সাময়িক ভুলিয়ে ভোটে হয়ত জেতা যায়, কিন্তু তারপর সাময়িক ঘোর কাটিয়ে মানুষ যখন হিসেব কষতে বসে এবং দেখে জমার ভাঁড়ারে শূন্য, তখন একদিনের মসিহা দ্রুত প্রতারকে পরিণত হয়। মোদি সরকার সম্পর্কে মানুষের সেই মোহভঙ্গই দ্রুত ঘটছে।

কলকাতা। ফাইল চিত্র

পাঁচের পাতায় দেখুন

নেপালে ভূকম্প পীড়িত মানুষের পাশে এস ইউ সি আই (সি)

২১ মে, কাঠমাণ্ডু ঃ আজ কাঠমাণ্ডু পৌঁছে এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান বিকালে দেখা করেন কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী)-র নেতা কমরেড পুষ্পকুমার দহল ‘প্রচণ্ড’র সাথে তাঁর সরকারি আবাসনে। প্রতিবেশি দেশ নেপালের ভূকম্প বিধ্বস্ত মেহনতি জনগণের প্রতি সাহায্য সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভারতের মেহনতি জনগণ এস ইউ সি আই (সি)-র আবেদনে সাড়া দিয়ে ত্রাণ তহবিলে যে অর্থ দান করেছেন, সেই দানের ২৫ লক্ষ ভারতীয় টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট কমরেড প্রচণ্ডর হাতে তুলে দেন কমরেড চক্রবর্তী। নেপালের মেহনতি জনগণের দুঃখের সাথী হওয়ার জন্য এস ইউ সি আই (সি) এবং ভারতের জনগণকে ধন্যবাদ জানান কমরেড প্রচণ্ড।

কমরেড প্রচণ্ড'র হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

এস ইউ সি আই (সি)-র মেডিকেল ফ্রন্ট বর্তমানে নেপালের বিধ্বস্ত জেলাগুলির দোলাখা, কাঠমাণ্ডু, নুয়াকোট ও ললিতপুরে গত কয়েক দিনে ২০টিরও বেশি মেডিকেল ক্যাম্প করে ৩ হাজারের উপর রোগীর চিকিৎসা করেছে। ভারত থেকে সংগৃহীত ওষুধ বিতরণ করেছে। এ বিষয়ে দুই নেতার মধ্যে মতবিনিময় হয়। গত প্রায় অর্ধদশক ধরে এস ইউ সি আই (সি)-র মেডিকেল ফ্রন্ট হিমালয় অঞ্চল, উত্তরাখণ্ড, জম্মু-কাশ্মীর ও বর্তমানে

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে প্রবল দাবদাহের মধ্যেই চলছে

গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম কমানো, চাষির জমি লুঠের কালা অর্ডিন্যান্স বাতিল সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে রাজ্য জুড়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর কর্মী-স্বেচ্ছাসেবকরা দিনভর প্রবল রোদের মধ্যেও মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন। বিস্মিত মানুষজন প্রশ্ন করছেন, কীসের জোরে আপনারা এ ভাবে দিন নেই রাত নেই পরিশ্রম করে যান? সেদিন উত্তর কলকাতায় একজন স্বাক্ষর দিতে দিতে বললেন, আমি কিন্তু অন্য বামপন্থী দল করি। আমার দল কিছু করছে না। আপনারাই চেষ্টা করছেন, রাস্তায় আছেন। প্রবীণ আর এক বামপন্থী মানুষ দুঃখের সাথে বললেন, একদিন ছিল যখন ভোটে হারলেও আমাদের ইজ্জত ছিল। আজ সেটাই নষ্ট করে দিয়েছে। পার্টির কাছে আমরা এখন নিছকই ভোটার। একজন গরিব মানুষের জন্য কিছু করার আগে নেতারা জিজ্ঞেস করে, ও কি আমাদের ভোট দেয়? এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। আপনারা সেই বামপন্থী ধারাটা নিয়ে চলছেন। (ছবিতে) কলকাতার বেহালায় স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে।

পিংলায় শিশুমৃত্যু এক নির্মম বাস্তবকে স্পষ্ট করল

পিংলার ব্রাহ্মণবাড়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে যে ১২ জনের প্রাণ গেছে তাদের মধ্যে ৯ জনই শিশু-কিশোর বা অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। অতদূর থেকে বোমা বারুদের কারখানায় কে তাদের টেনে আনল, কেন আনল, কতদিন ধরে এরা এসেছে, অর্থাৎ আরও কত ছোট বয়স থেকে ঘরবাড়ি মা-বাবা সব ছেড়ে প্রত্যন্ত পিংলায় এরা পৌঁছাল এ সব প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমক যেমন রাতের গভীর আঁধার চিরে মুহূর্তকালের জন্য পার্শ্ববর্তী বহুকিছু স্পষ্ট করে দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়, তেমনি পিংলার বোমা বিস্ফোরণে শিশুগুলির মৃত্যুতে এ রাজ্যের তথা সারা দেশের লক্ষ কোটি শিশুর বাঁচা মরার বাস্তব অবস্থাটা সমাজ চেতনার বুকে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়ে গেল।

সুস্থ সমাজ চেতনা অনুসারে শৈশব ও কৈশোর প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠার ভিত্তিপর্ব। স্বাভাবিক ছন্দের মধ্যে দিয়ে খেলাধুলা, পড়াশোনা, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন — এগুলিই বড়দের কাছ থেকে তাদের পাওয়ার কথা। কিন্তু আর্থিক সংগতি সম্পন্ন কিছু পরিবার ছাড়া অধিকাংশ হতদরিদ্র পরিবারে শিশু জন্মই নেয় পেটের জ্বালা নিয়ে। একটু বড় হয়েই তারা দেখতে পায় মা-বাবা সহ পরিবারের সকলের একই দুর্দশা। কীভাবে কখন শৈশব দুমড়ে মুচড়ে পেটে ঢুকে যায় তা বোঝার অবসরও থাকে না। এরপরেই মুনাফা পিপাসু সমাজে সস্তা শ্রমের কচি কচি হাতগুলি নিয়ে এরা ব্যবসায়ী হাঙরের পেটে তলিয়ে যায়। এদের পরিচয় এরা শিশুশ্রমিক। আইন শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করলেও এদের অস্তিত্ব এবং ক্রমবৃদ্ধি আইনকে বড় বিদ্রূপ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনও না কোনও মালিকের কারখানাই এদের ঠিকানা। অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি করে। চায়ের দোকান, হোটেল কর্মী, জরি শিল্প, হোসিয়ারি কারখানা বা এমনই কিছু একটা খুঁজে নিয়ে বাঁচবার লড়াইতে প্রতিটা দিন আর রাত কাটে এদের। এই সুযোগে সরকারি-বেসরকারি কন্ট্রাক্টররা এদের 'নিয়োগ' করে। তারপর দরিদ্র-পীড়িত পরিবারে জন্ম নেওয়া কোটি কোটি মানবশিশু স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ হারিয়ে ধীরে ধীরে বিরাট সংখ্যায় অন্ধকারের জগতে তলিয়ে যায়। অপর একদল ধনলোভী শিশু পাচার চক্র গড়ে তুলে কিডনি সহ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রির ব্যবসা কিংবা মেয়ে হলে তাদের দেহ নিয়ে ব্যবসা করে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সর্বত্রই চলছে এই নির্মমতা। ভারতবর্ষ সেই জগৎ সভায় 'শ্রেষ্ঠ' আসন দখল করেছে। এ দেশেই সন্তান জন্ম দেওয়ার পূর্বে মায়ের মৃত্যু সর্বাধিক। শিশু মৃত্যু, শিশু পাচারে এ দেশ সর্বোচ্চ শিখরে। এই বাস্তবতা আমাদের গৌরব নাকি লজ্জার? মুর্শিদাবাদের সূতি থানার শিরিনা বিবি ছুটে এসেছিল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে। পিংলার বিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত তার দুই কচি কচি ছেলে জহিরুদ্দিন আর মুস্তাককে দেখতে। সঙ্গে আরও একটি কচি ছেলে। বুকফাটা আর্তনাদ করতে করতে সে বলে চলেছে 'তোদের বাপটাও মাত্র ৮ মাস আগে পাণ্ডুয়ায় একই ঘটনায় চলে গেছে। তোদের আজ এই অবস্থা। আমার সংসার কী হবে? এরা রাজমিস্ত্রির কাজ দেবে এই মিথ্যা কথা বলে নিয়ে এসেছিল।' কেন শিরিনা বিবিরা স্বামী যাওয়ার পরেও কচি কচি ছেলেগুলোকে এ ভাবে বেঘোরে মরার দিকে পাঠিয়ে দেয়? সঙ্গের কচি ছেলেটারও এমনি কোনও দশা হবে না আর ক'বছর বাদে সে কথা কে বলতে পারে? কোন সংকটে পড়ে মা তার গর্ভাবস্থাতেই ভবিষ্যৎ শিশুকে ২০০ টাকায় বিক্রি করে? এই সব কেন-র উত্তর এ দেশের কোনও সরকার দিতে রাজি নয়। তারা মিষ্টি মিষ্টি আইন করে।

১৯৮৬ সালে ভারত সরকার ফলাও করে জারি করেছে 'শিশুশ্রম নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন'। '৮৮ সালে তা রূপায়ণের জন্য ঘোষিত হয়েছে রেগুলেশন। এ দেশের 'উন্নয়ন পাগল' সরকার একদিকে দেশি বিদেশি ধনকুবেরদের জন্য উদার নীতি নিয়ে বিশ্বায়নের দরজা খুলে শোষণ লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে, একই সাথে খাদ্য সুরক্ষা আইন, শিক্ষার অধিকার আইন ইত্যাদি একের পর এক আইন পাশ করিয়ে চলেছে। দরিদ্রের বেলায় বাস্তবে খাদ্যও নেই, শিক্ষাও নেই। অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির রিপোর্ট বলছে এ দেশে ৭৭ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ২০ টাকার কম। এতে প্রাণ বাঁচে? খাদ্য সুরক্ষা আইন আইনেই আছে। তেমনি শিশুশ্রম নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণও আইনেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে তার প্রয়োগ নেই। সম্প্রতি বিজেপি সরকার এক নতুন ফরমান এনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিশুশ্রমকে আইনসম্মত করেছে। দারিদ্রকে কাজে লাগিয়ে সস্তার শ্রমিক হিসাবে শিশুদের নিয়োগ মালিকের মুনাফা বাড়াবে, বিপন্ন হবে শৈশব। ব্যাহত হবে শিশুর শিক্ষা ও বিকাশ। শিশুদের বলা হয় জাতির ভবিষ্যৎ। জাতির ভবিষ্যৎ আজ পুঁজির শোষণে বিপন্ন।

কাল মার্কস তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সস্তা শ্রম লুণ্ঠনের জন্য কারখানার মধ্যেই আটকে রেখে প্রায় ২৪ ঘন্টা শিশুদের খাটানোর অসংখ্য নিষ্ঠুর নজির তুলে ধরেছেন। তাঁরই চিন্তাকে অবলম্বন করে মহান লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়াই প্রথম দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে শিশুশ্রম মুক্ত রাষ্ট্র গড়েছেন। কোনও বুর্জোয়া রাষ্ট্রই তা পারেনি। সেখানে কেবল লোকদেখানি আইনই আছে।

ভারত সরকার প্রণীত উক্ত আইনে ১৩ নং ধারায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে 'ইউ' উপধারায় আছে কোনও বিস্ফোরক জাতীয় কাজে শিশুদের লাগানো যাবে না। ৭নং ধারার ৪ নং উপধারা অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত এদের কাজে লাগানো নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রণীত ২০০৮-এর আইনের 'বি' সিডিউলের ৫নং উপধারায় একই কথা বলা আছে। এই আইন অমান্য হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য সরকারি কমিটি এবং ইনস্পেক্টর নিযুক্ত আছে। কোটি কোটি টাকাও বরাদ্দ আছে। আইনে বলা হয়েছে, কোনওভাবে উক্ত বিষয় লঙ্ঘিত হলে মালিকদের দু'বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হবে। কিন্তু ওই বলা পর্যন্তই। পিংলার ঘটনায় প্রমাণিত, এই দুটির কোনওটিই পালিত হয়নি। ৬ মে বিস্ফোরণ ঘটেছে রাত্রি প্রায় দশটায়। মৃত ১২ জনের মধ্যে ৯ জনই শিশু। কেবল এটুকুই নয়, এলাকাবাসী বারে বারে পুলিশ প্রশাসনকে ঐ কারখানা সম্পর্কে অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টে দেখা গেছে এতবড় ঘটনা, এতগুলি মৃত্যুর পর শাসক দল ঘনিষ্ঠ মালিক রঞ্জন মাইতির বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর ধারা দিয়েছিল পুলিশ। গণপ্রতিবাদ ও বিরাট আলোড়নের ফলে ৫ দিন পরে ৩০২ ধারা যুক্ত করেছে তারা। তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার সি আই ডি নিয়োগ করেছে। পুলিশের বয়ানই তারা বলে যাচ্ছে, যেমন ঘটেছিল নন্দীগ্রাম কিংবা নেতাইয়ের বেলায় তদানীন্তন রাজ্য সরকার নিযুক্ত সি আই ডি তদন্তে। বিস্ফোরণের পরপরই পুলিশ গোটা ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে, মাছি গলা ভার। এলাকাবাসীও দফায় দফায় লাঠিপেটা খেয়েছে দেখতে গিয়ে। কিন্তু ৯ দিন বাদে ১৫ মে দুপুরে আবার ঐ স্থানেই বিস্ফোরণ ঘটল। কে বা কারা দায়ী? বোমা বিশেষজ্ঞ সি আই ডি, ফরেন্সিক অফিসারদের এত ঘোরাফেরায় কি অনুসন্ধান চলছে, না কি ক্রিমিনালদের আড়াল করার জন্য তথ্য চাপা দেওয়ার চেষ্টায় সবাই ব্যস্ত?

পিংলায় সরকারি দলের বাধায় অন্যান্য দলগুলি সভা-মিছিল করতে পারেনি। একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) স্থানীয় থানা, বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ, জেলাশাসক ও এসপি দপ্তরে বিক্ষোভ এবং ৯ মে পিংলা থানা এলাকায় সফল বনধ করেছে। কোনও আইন, কোনও প্রশাসনের মুখাপেক্ষী হয়ে এই ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। এলাকাবাসীকেই দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে গণকমিটি গঠন করে এগিয়ে আসতে হবে। যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা শিশুশ্রমের উৎস, সেই ব্যবস্থা নির্মূল করাই নিষ্পাপ শিশুদের বাঁচার রাস্তা তৈরি করতে পারে।

শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের আত্মোৎসর্গের শতবর্ষ পালিত

শতবর্ষ পরেও অম্লান শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের স্মৃতি। ১৯১৫ সালের ১১ মে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিল। দেশের মানুষের উপর ব্রিটিশ শাসকদের সীমাহীন অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে, ২৩ ডিসেম্বর ১৯১২, দিল্লির বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমা ছোঁড়েন বসন্ত বিশ্বাস। বড়লাট আহত হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বুকে কাঁপন ধরে যায়। দেশ তোলপাড় করে বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে তারা। শুরু হয় দিল্লি-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। ১০ মে দিল্লি জেলে ফাঁসি হয় আমির চাঁদ, বাল মুকুন্দ এবং অবোধ বিহারির। পরদিন আম্বালা জেলে ফাঁসির মঞ্চে জীবন দেন বসন্ত বিশ্বাস।

শহিদের আত্মোৎসর্গের শতবর্ষে ১১ মে তাঁর জন্মস্থান নদীয়া জেলার মুড়াগাছাতে আত্মোৎসর্গ শতবর্ষ কমিটির পক্ষ থেকে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়। শহিদ বসন্ত বিশ্বাস মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এবং আত্মোৎসর্গের শতবর্ষ কমিটি কৃষ্ণনগর স্টেশন সংলগ্ন খেজুরতলায় মূল অনুষ্ঠান করে। কমিটির পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর শহরে শহিদের মূর্তি স্থাপন, শহরের একটি রাস্তা শহিদের নামে নামকরণের দাবি জানানো হয়। শহিদের স্মৃতি বিজড়িত মুড়াগাছা স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে বসন্ত বিশ্বাসের নামে করার দাবি জানানো হয়।

বজবজে দাবি আদায়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ ২ নং ব্লকের ডোঙ্গারিয়া রায়পুর অঞ্চলে এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিকমুক্ত জল প্রকল্প থেকে এলাকার লোক পানীয় জল না পেলেও গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গেছে প্রকল্পের বর্জ্য জলে। ফলে এলাকার চাষের জমি, পুকুর, ডোবা, ডাঙা জলের তলায়। মশা, মাছির উপদ্রবে রোগ ছড়াচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ২০১২ সালে এলাকার সর্বস্তরের নাগরিককে নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'গ্রাম ও চাষি বাঁচাও কমিটি'। সেই সময় অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে খাল কেটে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। জমা জলে এবার আবারও দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হলে কমিটির নেতৃত্বে এলাকার মানুষ গত এক মাস ধরে জল প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার, প্রধান, ব্লক সভাপতি, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিকারের জন্য আবেদন জানায়। ৮ মে কমিটির নেতৃত্বে শতাধিক গ্রামবাসী বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন অজয় ঘোষ এবং সভা পরিচালনা করেন তাম্রধ্বজ আদক। গ্রামবাসীদের দাবি মেনে ১৫ মে জল প্রকল্পের ইঞ্জিনিয়ার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উপস্থিতিতে বিডিও-র উদ্যোগে সমগ্র প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ডেয়ারি শিল্পে গণবদলির প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের

প্রাণী সম্পদ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ডাইরেক্টরেট অফ ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট-এর প্রায় ১১০০ কর্মীকে স্বাস্থ্য দপ্তরে গণবদলি করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯ মে এক বিবৃতিতে বলেন, বিগত বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসারী হয়ে ডেয়ারিগুলির রুগ্ন দশা সৃষ্টির জন্য দায়ী। কর্মচারী আন্দোলনের নামে জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সংকীর্ণ দলবাজি এবং মাথাভারি প্রশাসনকে প্রশ্রয় দিয়েছে। দুধের প্রবল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আগের সরকারের ধারাবাহিকতাতেই একটার পর একটা ডেয়ারি তুলে দিচ্ছে বর্তমান সরকার। যথাযথ কর্মচারী আন্দোলনের অভাবে কিছু আমলাকে বর্তমান সরকার চূড়ান্ত ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছে, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে কোনও আক্রমণ নামিয়ে আনার। আগামী দিনে মাদার ডেয়ারিকেও কোম্পানি করার দিকেই বর্তমান সরকার যাচ্ছে। তিনি বলেন, এই গণবদলি ডেয়ারি শিল্পকে বিপন্ন করবে এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ডেয়ারিগুলির রমরমা হবে ও ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

নেপালের ভূকম্প পীড়িতদের পাশে

একের পাতার পর

নেপালে বিপর্যয়ে কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে তাও কমরেড চক্রবর্তী বর্ণনা করেন। এরকম একটি মেডিকেল ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরও আছে বলে কমরেড প্রচণ্ড জানান।

এছাড়াও কমরেড প্রচণ্ডের হাতে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখার সংকলন এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাসঙ্গিক রচনাও কমরেড চক্রবর্তী তুলে দেন। বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও দুই নেতা মত বিনিময় করেন। উভয়েই এই প্রত্যয় ঘোষণা করেন যে, এই ধরনের মত বিনিময় দুই পার্টির ও দুই দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করবে।

কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষকরাই অবহেলিত

১২১ কোটিরও বেশি মানুষের দেশ ভারত। এই জনসংখ্যার ৭২.২ শতাংশ অর্থাৎ ৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ বাস করে গ্রামে। এই হিসাব ২০১১ সালের সরকারি সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী। স্বাভাবিকভাবেই বর্তমানে এই সংখ্যা কয়েক কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামীণ মানুষের ৫৩ শতাংশ অর্থাৎ ৪৬ কোটি ৩৭ লক্ষ মানুষ কৃষি কাজে যুক্ত। যদিও এই হিসাবেও কারচুপি আছে। বাস্তবে এই সংখ্যা আরও বেশি। বর্তমান সময়ে গোটা দেশে চাষি আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং ক্রমেই তা আতঙ্কজনক ভাবে বাড়ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় চাষি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি নানা প্রতিশ্রুতি ও সরকারি পরিকল্পনার কথা ভাষণে ও কাগজপত্রে ফলাও করে প্রচার করছে। গরিব চাষি এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে বাঁচার কোনও পথ পাচ্ছে না, বরং সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

কৃষি একটা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন রক্ষাকারী উৎপাদনমাধ্যম। মানুষের অন্নের যোগানদাতা। এক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক দায়ভার সর্বাধিক। কৃষকের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকলে কি কেন্দ্র, কি রাজ্য কোনও সরকারই তা এড়িয়ে যেতে পারে না। বর্তমানে দেশের প্রায় সর্বত্র সাবেকি কৃষির অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। বর্তমানে চাষের উপকরণ হল অত্যন্ত দামি সংকর জাতীয় উচ্চ ফলনশীল অথবা বিটি বীজ। এই জাতীয় চাষের উপযোগী নানা ধরনের রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, সময়মত সেচ ও পরিচর্যা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। গরিব, ছোট বা মাঝারি চাষির পক্ষে চাষের খরচ জোগানো বড়ই কঠিন। ফলে গরিব, ছোট এবং মাঝারি চাষি ঋণ করতে বাধ্য হয়। বড় ও ধনী চাষিরা ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রভৃতি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের সুবিধা ভোগ করে। ছোট, মাঝারি এবং গরিব চাষিরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ব্যাঙ্কে ঋণ নিতে গেলে গরিব মানুষকে ধরতে হয় দালাল, নানা নিয়মের জালে তাদের হয়রানি ভোগ করতে হয়। ফলে গরিব, নিম্ন ও মধ্য চাষিকে ঋণ সংগ্রহ করতে হয় চড়া সুদে মহাজন ও সুদের কারবারিদের কাছ থেকে। চাষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণও বর্তমানে দেশীয় বড় বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠী, কর্পোরেট হাউস এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কুক্ষিগত। তাছাড়া প্রয়োজন বিদ্যুৎ এবং জলসেচ। এখন পর্যন্ত সেচসেবিত জমির পরিমাণ মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র ৩৫ শতাংশ। কাগজ-কলমের এই হিসাবের সাথে বাস্তবে সেচ সেবিত জমির পরিমাণের বিস্তর ফারাক। ফলে বিশাল পরিমাণ চাষের জমিতে বৃষ্টির জলই একমাত্র সম্বল। চাতক পাখির মতো সেই জলের জন্য চাষিকে অপেক্ষা করতে হয়। সেচের পাম্প চালানোর বিদ্যুতের দাম ক্রমাগত বাড়ছে, বাড়ছে পাম্প চালানোর ডিজেল বা কেরোসিনের দাম। তাছাড়া আছে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং খরা-বন্যার প্রকোপ। চাষির ফসল জমিতেই অনেকটা নষ্ট হয়। পোকা লাগা, বীজ ভাল না হওয়ায় ফলনের সমস্যা তো থাকেই। এসব সত্ত্বেও যতটুকু ফসল চাষি ঘরে তুলতে পারে তার ন্যায্য দাম তাদের জোটে না। কোল্ডস্টোরেজের মালিক, ফড়ে, আড়তদার, কালোবাজারিরা চাষির অভাবের সুযোগে সামান্য দামে ফসল কিনতে নানা কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করে। ঋণগ্রস্ত অভাবি চাষি এদের খপ্পরে পড়ে জলের দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। প্রতি বছর ফসল ওঠার সময় এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে চাষিদের ফেলা হয়। কাগজে কলমে সরকারি সহায়ক মূল্যে ফসল কেনার একটা বন্দোবস্ত থাকে, তবে সে বন্দোবস্তর হদিস চাষিরা পায় না। যখন সরকার ফসল কিনতে আসরে নামে তখন চাষির ঘরে আর ফসল নেই, তারা সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যার মিছিলের সংখ্যা বাড়ায়। বছরের পর বছর এ অবস্থাই চলছে।

যে খেতমজুর ও চাষি দেশের খাদ্য সম্ভার গড়ে তোলে, দেশের জনসাধারণের মুখে অন্ন যোগায় তারাই যখন আত্মহত্যায় বাধ্য হয় তখন সহজেই অনুমান করা যায় দেশের আর্থিক অবস্থার করুণ রূপটি। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো'র ২০০২ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এক দশকের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গোটা দেশে চাষিমৃত্যুর হার ২২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হিসাব অনুযায়ী ২০০২ সালে চাষি মৃত্যুর সংখ্যা যেখানে ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ৪১৭ সেখানে ২০১২ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৪৫। **কয়েকটি প্রদেশে ২০০২ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত চাষি মৃত্যুর এই সংখ্যা ও হার হল যথাক্রমে তামিলনাড়ু ১৬ হাজার ৯২৭ (১২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি), মহারাষ্ট্র ১৬ হাজার ১১২ (১১.৯ শতাংশ বৃদ্ধি), পশ্চিমবঙ্গ ১৪ হাজার ৯৫৭ (১১ শতাংশ বৃদ্ধি), অন্ধ্রপ্রদেশ ১৪ হাজার ২৩৮ (১০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি)। ১৯৯৫ সাল থেকে এই হিসাব ধরলে চাষি মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৪০।**

মহারাষ্ট্রকে দেশের সর্বাপেক্ষা ধনী রাজ্য বলা হয়। সেখানেই রেকর্ড সংখ্যক চাষি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যে মোট ৫৪ হাজার চাষি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। চাষি মৃত্যুর হারের এই হিসাবেও আছে কারচুপি। সব চাষি আত্মহত্যাকে পুলিশের খাতায় বা বলতে পারা যায় আইনগত কূটচালে নথিভুক্ত করা হয় না। দেখা যায়, বাম ডান নির্বিশেষে যখন যে দলই সরকারে থাকুক না কেন চাষি মৃত্যুকে নানা ছুতোয় তাদের অস্বীকার করার প্রবণতা থাকে, যাতে সরকারের গায়ে কোনও কালির আঁচড় না লাগে। এই দায় থেকে সরকার নিজেকে মুক্ত রাখতে অত্যন্ত চালাকি অবলম্বন করে। আবার এই হিসাব তৈরিও হয় আমলাদের সহায়তায় সরকারি দলের মর্জিমাফিক। তাদের ব্যাখ্যায় চাষি হল তারাই— গ্রামাঞ্চলে জমির মালিক নিজে অথবা অন্যের জমি নিয়ে কেউ যদি চাষ করে তাদেরই একমাত্র চাষি হিসাবে গণ্য করা হয়। চাষি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যারা চাষের নানা কাজে সাহায্য করে বা গ্রামাঞ্চলে যারা চাষের অন্যান্য কাজে সাহায্যকারী শক্তি, যাদের ভরণপোষণ চাষের উপরই নির্ভর করে তাদের চাষি হিসাবে গণ্য করা হয় না। যার ফলে এই অংশের মানুষের মৃত্যুকে চাষি মৃত্যুর সংখ্যা হিসাবে সরকারি নথিতে ধরা হয় না।

সংবাদমাধ্যমে সব ঘটনা প্রকাশিত হয় না, যে অল্প দু-চারটি মৃত্যু নিয়ে জনমনে তোলপাড় হয় সে রকম কিছু ঘটনা সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত হয়। আবার সে সব সংবাদও ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সরকার পক্ষ থেকে চেষ্টাও চলে। আত্মহত্যার মতো দুঃখজনক ঘটনাকে রাজ্য সরকার চাষির ঋণগ্রস্ততা বা উৎপাদিত ফসলের দাম না পাওয়ার ফলে আত্মহত্যা বলে মানতে অস্বীকার করে নানা কুরুচিকর মন্তব্য করতে কসুর করেনি। সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রী এবং সরকারি আমলারা সেই মৃত্যুকে পারিবারিক কলহ, হতাশা, কু-সম্পর্ক প্রভৃতি বিশেষণ দিয়ে সরকারি দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। এই বছরে ধান ওঠার সময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই একই চিত্র দেখছে। আড়তদার, কালোবাজারিরা এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা ৬০০ টাকা কুইন্টাল প্রতি ধানের দাম নির্ধারণ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সরকার নির্বিকার। অনেক টালবাহানার করে তারা ১৩৬০ টাকা কুইন্টাল সহায়ক মূল্য স্থির করলেও কোথাও ধান কেনার কোনও ব্যবস্থা করেনি। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, চালকলগুলি চাষির থেকে ধান না কিনে ফড়েদের থেকেই ধান কিনছে। অথচ সরকার একটি চালকলের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়নি। সরকার যদি কমপক্ষে ১৮০০ টাকা কুইন্টাল দরে চাষির কাছ থেকে ধান কেনার ব্যবস্থা না নেয়, গোটা রাজ্যে ধানচাষির আত্মহত্যার ঘটনাও ব্যাপক রূপ নেবে।

চাষি জীবনে এই সংকট এত ব্যাপক যে চাষি পরিবারগুলি জীবিকার সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে, এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে, এমনকী আরব দুনিয়ায় কাজের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের রিপোর্টের হিসাব বলছে, সারা ভারতে এক দশক আগেও যেখানে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত ছিল সেখানে ২০১২ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি মানুষ কাজের সন্ধানে ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে। সারা ভারতে ১১টি প্রদেশের ৬০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার গভীরভাবে ঋণের ভারে জর্জরিত। এই ৬০ শতাংশ মানুষের প্রতিদিনের জীবন ধারণের জন্য ব্যয় করার ক্ষমতা দৈনিক মাত্র ৩৫ টাকা, (জুলাই ২০০৯ থেকে ২০১০ এর হিসাব)। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে গ্রামীণ জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষের প্রতিদিন খরচ করার ক্ষমতা মাত্র ১৫ টাকা।

ক্ষমতাসীন দলগুলি পুঁজিপতি শ্রেণি ও কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে শোষণের এক উর্বর ক্ষেত্র হিসাবে কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রকে তুলে দিয়েছে। ফলে চাষির না আছে স্বাধীনভাবে চাষের অধিকার, না আছে ফসল তোলা বা দাম নির্ধারণ করার অধিকার। এর উপর চাষযোগ্য জমির ওপর পুঁজিপতিশ্রেণির লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে এবং সে জমি কব্জা করার এক নির্মম সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচার করা জরুরি তা হল, আগামী দিনে দেশের খাদ্য উৎপাদন এক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। কৃষি জমির উপর পুঁজিপতিশ্রেণির আগ্রাসী ও লোলুপ দৃষ্টির ফলে দিনে দিনে কৃষি জমি চাষিদের হাতছাড়া হচ্ছে। ২০১০-১১ সালে কেন্দ্রের কৃষিমন্ত্রী ২০টি রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের হিসাব দিতে গিয়ে বলেছেন, কৃষি জমির পরিমাণ ২০০৭-০৮ সালের থেকে ২০১০-১১ সালে ৭ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর কমেছে। (দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া,১৬ আগস্ট২০১৩)। বিশ্বে জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা একটি রাষ্ট্রে খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দরকার এবং যে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সরকার তা করেনি। লক্ষ লক্ষ একর অকৃষি জমি পড়ে থাকা সত্ত্বেও সেগুলিতে শিল্প-কারখানা বা অন্যান্য প্রকল্প না গড়ে তুলে জমি জোর করে দখল করে কৃষকদের উচ্ছেদ করছে এবং কৃষি জমি ধ্বংস করছে। এই বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ যা করেছে এবং যেভাবে করতে চলেছে তার প্রায় ৩৬ শতাংশ আদিবাসী এবং তফসিলি জনজাতির। অথচ অতীতে চাষির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হাজার হাজার একর জমিতে না হয়েছে শিল্প, না পাওয়া গেছে ক্ষতিপূরণ, না দিয়েছে পুনর্বাসন। রিপোর্ট বলছে, দেশে ৪৫ হাজার ৬৩৫ হেক্টর অধিকৃত জমির মধ্যে ৩৮ শতাংশই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আসলে শিল্পপতিদের জমির চাহিদা এসইজেড গড়ার জন্য, বিশেষ বিশেষ এলাকার রেল লাইন ও জাতীয় সড়কের দুইপাশে নানা ধরনের বিপণি, শপিং মল আর বিশাল বিশাল আবাসন গড়ার জন্য। আর আছে সড়ক, সেতু নির্মাণে বিনিয়োগ করে টোল বসিয়ে বিপুল লাভ করার পরিকল্পনা। এর সঙ্গে আছে বেসরকারি ব্যবসা ভিত্তিক স্কুল-কলেজ, হাসপাতালের জন্য জমি দখল।

চাষের জমি চাষির কাছ থেকে জোর করে দখল করতে অতীতে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং রাজ্যের সিপিএম সরকার কেউই কসুর করেনি। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে সিপিএম সরকারের জোর করে জমি দখলের জন্য কী নৃশংস অত্যাচার —এ রাজ্যের মানুষের স্মরণে আছে। নন্দীগ্রামের মানুষ আন্দোলন করে তা রুখেছে। এর ফলে ২০১১ সালে জমি অধিগ্রহণের জন্য নতুন করে আইন করতে কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সেটুকু আইনি বাধ্যবাধকতাও কেন্দ্রের বিজেপি পরিচালিত মোদি সরকার তুলে দিয়ে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এক দানবীয় আইন করতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

আসলে প্রধানমন্ত্রী মোদিজি মালিক শ্রেণির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে পুঁজিপতিদের সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে সরকারি ক্ষমতায় মোদিজির আরোহণ, তাদের চাহিদা তো তাঁকে মেটাতেই হবে। দেশের স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৭ কোটি মানুষকে জমি অধিগ্রহণ করে উৎখাত করা হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য এই অধিগ্রহণ। গ্রামীণ জীবনে মানুষের ভরণ-পোষণ থেকে প্রায় সবকিছুই পুরোপুরি জমির উপর নির্ভর। তাছাড়া যতটুকু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তা শুধু জমির মালিকের জন্য। ফলে খেতমজুর, ভাগচাষি, জমির সাথে যুক্ত নানা পেশার মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়ে। বর্তমানে মোদী সরকারের জমি অধিগ্রহণের বিল কার্যকর হলে দেশের গ্রামে গ্রামে উঠবে হাহাকার, গ্রামগুলিতে নেমে আসবে শ্মশানের নীরবতা।

এ আই এম এস এস-এর কেরালা রাজ্য সম্মেলন

‘কেন্দ্রীয় সরকার ভারতকে একচেটে পুঁজিপতিদের হাতে সমর্পণ করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সুমহান স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। নবজাগরণের সাংস্কৃতিক আন্দোলন আজ বিস্মৃতির অতলে। ভারতের সংবিধান নারীদের সমানাধিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আজ জরুরি প্রয়োজন নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন’ — কথাগুলি বলেছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এবং কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ কে কে এন কুরুপু। ৮ মে আলেপ্পি শহরে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কেরালা রাজ্য শাখার চতুর্থ সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় উদ্বোধনী ভাষণে এ কথা বলেন তিনি। মহিলাদের উপর অত্যাচার, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, মদের ঢালাও প্রসার ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং শ্রম-অধিকার হরণের প্রতিবাদে সারা রাজ্যে টানা দু’মাস প্রচারের পর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকাশ্য সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ছায়া মুখার্জী। তিনি ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ছবি তুলে ধরে বলেন, সর্বগ্রাসী পুঁজিবাদী সংকটে জনজীবন বিপর্যস্ত। তার মধ্যে নারীজীবনের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন স্ত্রী সুরক্ষা সমিতির সভাপতি ডাঃ ভিনসেন্ট মালিয়াকাল, ইন্ডিয়ান নার্সেস পেরেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ ডি সুরেন্দ্রনাথ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সভাপতিত্ব করেন কমরেড মিনি কে ফিলিপ।

৯ মে প্রতিনিধি সম্মেলনে ‘সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নারীসমাজ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার পেপার পেশ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড শাইলা কে জন। বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক উইমেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাংসদ ডাঃ টি এন সীমা, কেরালা মহিলা সংঘম-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কমলা সদানন্দন, রেভলিউশনারি মার্কসিস্ট পার্টির নেতা কে কে রিমা, মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (ইউনাইটেড)-এর নেতা পি কৃষ্ণাম্মাল, অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের রাজ্য সম্পাদক এন কে বিজু প্রমুখ। তাঁদের সম্মিলিত বক্তব্য আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে। মিনি কে ফিলিপ সম্পাদিত ‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর নারী যোদ্ধা’ পুস্তকটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কমরেড ভেনুগোপাল।

সম্মেলনে আকর্ষণীয় আলোচ্য বিষয় ছিল— ‘জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যা’। আলোচনা করেন অধ্যাপক পাপ্পোতি। মূল রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন ছাড়াও মূল্যবৃদ্ধি, শ্রম আইন সংশোধন, মদের বিপদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়।

কমরেড মিনি কে ফিলিপকে সভানেত্রী এবং কমরেড শাইলা কে জনকে সম্পাদক করে ১৩ জনের রাজ্য কমিটি এবং ৯৪ জনের রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। ১০ মে সন্ধ্যায় সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ডাঃ এইচ জি জয়লক্ষ্মী, এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সি কে লুকোস প্রমুখ।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে জেলায় জেলায়
কে কে এম এস-এর বিক্ষোভ

২৩ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ঝড়-শিলাবৃষ্টি ও গরম আবহাওয়ার জন্য বোরো মরশুমে ধান ও বাদাম চাষে ক্ষতি হয়েছে ৩০১ কোটি ৭৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকার ফসল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫ হাজার ৮৭৬ জন বোরো চাষি ও ১০ হাজার ২৪২ জন বাদাম চাষি। সারা জেলার ২৫টি ব্লকের ২৫১৫টি মৌজা ক্ষতির কবলে পড়েছে। জেলাশাসক ৩৩ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে এমন ১৩টি ব্লকের ১২৩৭টি মৌজাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মৌজা হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছে ৫৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। জেলা কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে ১২৩৭টি মৌজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ চেয়ে দরখাস্ত করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সব ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত কৃষকদেরই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানিয়ে জেলা কৃষি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে দুর্নীতি দলবাজি বন্ধ করে যথার্থ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক নন্দ পাত্র অভিযোগ করেন, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে ধানের মিল মালিক ও ফড়েদের চক্রান্তে ও

পূর্ব মেদিনীপুর

পুঞ্চা, পুরুলিয়া

প্রশাসনের উদাসীনতায় বোরো চাষের অভাবি বিক্রিতে ধানচাষিরা দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। অবিলম্বে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ক্যাম্প করার দাবি জানান।

কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, সার-বীজ-কীটনাশক-জলসেচ-মজুরি প্রভৃতি খরচ মিলে ১ কুইন্টাল ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড় খরচ হয় ১৪০০-১৫০০ টাকা। বর্তমানে খোলা বাজারে ধান বিক্রি হচ্ছে ৯০০-১০০০ টাকা কুইন্টাল। চাষি সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারলে তাদের খরচটুকু উঠবে। অথচ খাদ্য দপ্তর নানা অজুহাতে ধান কিনতে গড়িমসি করছেন।

রানাঘাটে ডাঃ হ্যানিমানের জন্মদিবস উদযাপন

২৬ এপ্রিল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার রানাঘাট শাখার উদ্যোগে সেখানে ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিমানের জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। শতাধিক চিকিৎসকের উপস্থিতিতে ডাঃ হ্যানিমানের চিকিৎসা নীতি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা সহ বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। সভাপতি ছিলেন ডাঃ সত্যজিৎ রায়।

রাঁচিতে ফ্যাসিবাদবিরোধী সভা

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ৭০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে ২২ মে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আয়োজিত আলোচনা সভা। বিষয় ছিল ফ্যাসিবাদের বিপদ ও প্রতিকারের পথ। সভায় বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তনে
বহু ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য, বিক্ষোভ তেলেঙ্গানায়

গালভরা নাম তার ‘কন্টিনিউয়াস কমপ্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশন’ — ধারাবাহিক সামগ্রিক মূল্যায়ন। কিন্তু এই মূল্যায়ন কীভাবে হবে, মূল্যায়নের সামগ্রিক রূপরেখাটি কী, ইত্যাদি নিয়ে যথাযথ ধারণা তৈরি না করেই তেলেঙ্গানা সরকার দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের উপর এই ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। তাও আবার ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের মাঝখানে। ফলে যথাযথ মূল্যায়নের অভাবে এবার মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় ১৯ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিজ্ঞানে ১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়।

উক্ত ছাত্রছাত্রীদের খাতা পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে ২৩ মে পেরেন্টস অ্যাসোসিয়েশন কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং এ আই ডি এস ও যৌথভাবে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের সামনে প্রতিবাদী ধর্নায় সামিল হয়। এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড গঙ্গাধর এই মূল্যায়ন পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানান। পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে ও পরে মুক্তি দেয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায়
আশাকর্মীদের আন্দোলন

‘অতীতের রানার কাঁধে চিঠির বোঝা সহ লাঠি আর লণ্ঠন হাতে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যেত। জয় করত ভয়, ডাকাত, সাপ-বাঘ-ভাল্লুক এবং হিংস্র জানোয়ারদের। আর আজ আমাদের মতো আশা কর্মীদের লাঠি-লণ্ঠন ছাড়াই আবছা মোবাইলের আলোয় গ্রামে গ্রামে ঘুরে সন্তানসম্ভবা মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে হয় অনেক সময় মদের নেশায় ডুবে থাকা কলুষিত গ্রামীণ পরিবেশের মাঝে। কোনও নিরাপত্তা নেই। ২৪ ঘন্টাই কাজ। পান থেকে চুন খসলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চোখরাঙানি-হুমকি। আমাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এ সবের বিরুদ্ধে’। কথাগুলি ৫ মে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর ২নং ব্লক সম্মেলনে এক আশা কর্মীর।

এই সুরেই সুর চড়িয়ে ১০ জন আশাকর্মী বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, নানা দাবি দাওয়া নিয়ে ১৭ মার্চ তাঁরা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের (বি এম ও এইচ)-এর কাছে ডেপুটেশন দিলে তিনি আশা কর্মীদের রাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থাকার ঘর, সাইকেল, মোবাইল দেওয়া সহ কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অজয় ঘোষ। প্রধান বক্তা এ আই ইউ টি ইউ সি-র কলকাতা জেলা সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড বঙ্কিম বেরা সারা দেশব্যাপী আশা কর্মীদের একমাত্র এই সংগঠনের অতীত দিনের লড়াইয়ের বহু ঘটনা উল্লেখ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সক্রিয় হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সম্মেলনে ২১ জনের কমিটি গঠিত হয়।

বজবজ-২ ব্লক ঃ ৪ মে ব্লকের প্রায় সব অঞ্চল থেকে আশা কর্মীরা নোদাখালি থানার মুচিশায় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। আধিকারিক তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে থাকা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থা, জেরক্স করার খরচ এবং ফরম্যাটের বিভ্রান্তি দূরীকরণ সংক্রান্ত দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্যা ইসমত আরা খাতুন এবং স্থানীয় সংগঠক অজয় ঘোষ।

মোদি সরকারের এক বছর

একের পাতার পর

নির্বাচনের আগে কল্পতরু সেজেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। জিনিসপত্রের দাম কমাবেন, সবার হাতে কাজ দেবেন, চাষির আত্মহত্যা রোধ করবেন, প্রশাসনে দুর্নীতি রোধ করবেন, কালো টাকা উদ্ধার করবেন, দেশের জন্য জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন এনে দেবেন। বলেছিলেন, আমাকে ক্ষমতায় বসাও আমি তোমাদের সবার জন্য 'আচ্ছে দিন' এনে দেব। বছর শেষে মানুষ দেখছে মোদি সরকার তাদের জীবনে কোনও আচ্ছে দিন আনেনি, বরং জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে। মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, গত এক বছরে জিনিসপত্রের দাম আরও আগুন হয়েছে। চাষি ফসলের দাম না পেলেও খাদ্যদ্রব্যের দাম লাফ দিয়ে বাড়ছে। চাল ডাল তেল শাক-সব্জি সব কিছুই আজ বড় বড় ব্যবসাদার আর মজুতদারদের কবজায়। নরেন্দ্র মোদির দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মোদি সরকার গত এক বছরে এমন একটি পদক্ষেপও নেয়নি যাতে বোঝা যায় মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারের কোনও সদিচ্ছা আছে। সরকার কালোবাজারি-মজুতদারদের কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি শুধু নয়, তারাই আজ সরকারকে, সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের ঘিরে রয়েছে। ফলে মানুষ ভালোমতোই বুঝে নিয়েছে, এই সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধে কিছুই করবে না। মোদি সরকার কিছুদিন আগেই ১০৮টি জীবনদায়ী ওষুধের থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছিল। সম্প্রতি ৫০৯টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম বাড়ানোর অনুমতি দিল। ডায়াবেটিস, হেপাটাইটিস বি এবং সি, ক্যান্সারের ওষুধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের দাম বাড়ানো হয়েছে। দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে চিকিৎসা ক্রমশ ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। মানুষ বিনা চিকিৎসায় মরছে, হাসপাতালের বাইরে ফুটপাথে পড়ে মরছে। জনগণের জীবনে এই হল মোদি সরকারের আচ্ছে দিনের নমুনা।

দেশের বিপুল সংখ্যক বেকারের জন্য কর্মসংস্থানের অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনও চেষ্টা মানুষের চোখে পড়েনি। নরেন্দ্র মোদিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি এক বছরে বিদেশ ভ্রমণের রেকর্ড করেছেন—আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি আরও কোথায় না গিয়েছেন। সবই নাকি বিনিয়োগ আনার জন্য। যেখানেই গেছেন পেটোয়া সংবাদপত্র তার ফলাও প্রচার দিয়েছে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সাফল্য বর্ণনা করেছে। মোদি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীদের সাথে নিজের ছবি তুলে টুইট করছেন, ১০ লাখ টাকার স্যুট পরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে নৈশভোজে যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনে তা কোন সুফল নিয়ে আসছে? মোদি সরকার যা করছে তার অর্থ, ভারতের মতো এত বড় একটা দেশ, এত বড় অর্থনীতি, তার উন্নয়ন নির্ভর করছে বিদেশি বিনিয়োগের উপর। অর্থাৎ বিদেশিরা যদি আমাদের কলে-কারখানায়, শেয়ার বাজারে টাকা খাটায় তবেই নাকি দেশের তথা অর্থনীতির উন্নতি ঘটবে। তাতে যে আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে, তার সুফল চুঁইয়ে পড়বে গরিব সাধারণ মানুষের মধ্যে। পুঁজিপতি শ্রেণির কত বড় সেবাদাস হলে তবে এমন চিন্তা মাথায় আসে! বিশ্বে কোথাও কোনও দেশ বিদেশি বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে? বস্তাপচা, ছেলেভুলানো এমন তত্ত্ব দেশের মানুষকে মোদিই প্রথম গেলাতে চেষ্টা করছেন না, তাঁর পূর্বসূরিরাও একই চেষ্টা করেছেন।

আসলে এঁরা জনগণের উন্নয়নের কথা মুখে বললেও বাস্তবে উন্নয়ন বলতে বোঝেন দেশের পুঁজিপতিদের উন্নয়ন। তারা পুঁজি খাটাতে পারছে কি না, তাদের মুনাফা বাড়ছে কি না, এই হল সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। না হলে দেশের সাধারণ মানুষের যে ক্রয়ক্ষমতার উপর অর্থনীতির যথার্থ উন্নয়ন নির্ভর করে, তা বাড়ানোর কোনও চেষ্টা সরকারের নীতিতে, কার্যকলাপে কোথাও নেই কেন? বরং সরকারের পুঁজিবাদী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত কমছে। ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হচ্ছে না। শিল্পোৎপাদনের হার ক্রমাগত নিচে নামছে। নতুন কারখানা গড়ে ওঠা দূরের কথা, হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হচ্ছে, শিফট বন্ধ হচ্ছে, ছাঁটাই বাড়ছে। এমন একটি সময়ে, যখন দরকার ছিল দেশের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, চাষির পাশে দাঁড়ানো তখন মোদি সরকারের ভূমিকা কী? মালিকরা যাতে অবাধে ছাঁটাই করতে পারে, লক-আউট, লে-অফ ঘোষণা করতে পারে তার জন্য শ্রম-আইনের খোল-নলচে বদলে ফেলে শিল্পপতি-বান্ধব শ্রমআইন নিয়ে আসছে। ছাঁটাই করার জন্য, লে-অফ, লক-আউট করার জন্য সরকারের কাছে মালিকদের কোনও জবাবদিহি করতে হবে না। যখন খুশি, যেমন করে খুশি তারা এসব করতে পারবে। মালিকদের জন্য একেবারে স্বর্গরাজ্য! গ্রামীণ বেকারদের কর্মসংস্থানও সরকারি নীতিতে সংকটগ্রস্ত। মহাত্মা গান্ধি গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনায় যে ১০০ দিনের কাজে গ্রামীণ বেকাররা কিছু কাজ পেত, তাকেও মোদি সরকার দেশের মাত্র দুশোটি ব্লকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এতেও যতটুকু কাজ হয়, সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তার মজুরি পেতেও কখনও ছ'মাস পার হয়ে যায়।

রোহটক, হরিয়ানা। ফাইল চিত্র

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলেছিলেন, ক্ষমতায় এলে ১০০ দিনের মধ্যে কালো টাকা উদ্ধার করে আনবেন। তার থেকে দেশের সব মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে ভরে দেবেন। এক বছর কেটে গেছে, একটি স্পেশাল টিম গঠন, আর পুরনো আইনগুলিই মোড়ক বদলে নতুন করে পাশ করানো ছাড়া সরকার এখনও পর্যন্ত কিছুই করেনি। এমনকী ক্ষমতায় বসে মোদি সরকার কালো টাকার মালিকদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করতে চাইছে না। তাঁদের হাবভাব দেখে প্রধান বিচারপতি এইচ এল দাত্তুর পর্যন্ত প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কেন সরকার কালো টাকার মালিকদের মাথায় নিরাপত্তার ছাতা ধরতে চাইছে। বাস্তবিক, কার নাম প্রকাশ করবেন মোদিরা, সবাই তো তাঁদেরই ভাই-বেরাদার। তাঁদেরই ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি, তাঁদেরই দলের কিংবা অন্য দলের নেতা-মন্ত্রী। তাঁদের টাকাই তো দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কে ভরে আছে। এখানে কংগ্রেস বিজেপি তৃণমূল মায়াবতী লালু জয়ললিতায় ফারাক নেই।

বাঙ্গালোর, কর্ণাটক। ফাইল চিত্র

দেশি-বিদেশি পুঁজির জন্য মোদি সরকার নির্বিচারে চাষির থেকে জমি কেড়ে নিতে একের পর এক অর্ডিন্যান্স জারি করে চলেছে এবং যে কোনও উপায়ে তাকে আইনে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সে উর্বর-অনুর্বর নির্বিশেষে যে কোনও জমি চাষিদের কোনও রকম মতামত ছাড়াই নেওয়া যাবে যদি সেগুলি জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা, গ্রামীণ পরিকাঠামো, ও গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রসার, পরিকাঠামো, শিল্প করিডর ও দরিদ্রদের জন্য আবাসনের নামে নেওয়া হয়। এই তালিকায় বিনিয়োগকে ঢোকাতে পারলেই আর ৮০ শতাংশ চাষির সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আম্বানি-আদানিদের মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লক্ষ্য তো তাই। আদানিরা এই জমিতে বন্দর গড়ে তুলে, তাপবিদ্যুৎ স্থাপন করে, কয়লা খনি নির্মাণ করে, আম্বানিরা কৃষ্ণা-গোদাবরী বেসিনে প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করে, বৃহত্তম কৃষি-রিটেল খুলে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করবে, কিন্তু তার জন্য যে কৃষকদের থেকে জমি নেবে তাদের কী লাভ হবে? তারা তো পথের ভিখারিতে পরিণত হবে। স্বাভাবিক ভাবেই জমি-আইনের প্রশ্নে দেশ জুড়ে মোদি সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠছে, মোদি পুঁজিপতিদের কাছে তাঁর ঋণ শোধ করছেন, তার সত্যতাই প্রকট হচ্ছে।

মোদির শাসনের এক বছরে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী কৃষকদের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে, মোদির সরকার যেহেতু পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে তাই কৃষকের স্বার্থ সেই বৃহৎ পুঁজির কাছে বলি দেওয়া হয়েছে। সরকারের পুঁজিবাদী নীতির কারণে কৃষি আজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আজ এমন কোনও ফসল নেই, যার জন্য কৃষককে বিপুল ব্যয় না করতে হয়। ধান পাট আখ তুলো আলু সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপুল ব্যয় করে ফসল ফলালেও চাষি ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। হাজার হাজার চাষি আত্মহত্যা করছে। তুলো চাষি, ধান চাষি, আলু চাষি, আখ চাষি সকলেই। অথচ চাষির প্রাণ-রক্তের বিনিময়ে ফুলে-ফেঁপে উঠছে চিনি কলের মালিকরা, তুলোর ব্যবসায়ীরা, ধানের ব্যবসায়ীরা, হিমঘরের মালিকরা, বীজ সার কীটনাশকের উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা। হাজার হাজার চাষি আত্মহত্যা করলেও সরকার তাদের ঋণ মকুব করে না, বিনা সুদে বা কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে না, অথচ বড় বড় শিল্পপতিদের দেদার ছাড় দিতে তাদের অসুবিধা হয় না। দেশের জনসাধারণের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের জন্য, খাদ্যের জন্য বরাদ্দকে সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা, তাদের অর্থপুষ্ট অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা বলেন ভরতুকি, বলেন, রাজকোষ ফাঁকা করে এভাবে ভরতুকি আর দেওয়া যাবে না। এদিকে পুঁজিপতিদের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা কর ছাড়, ইনসেনটিভ, স্টিমুলাস, কম সুদে ঋণ প্রভৃতি যা দেওয়া হয় সেগুলো নাকি ভরতুকি নয়। তার বেলায় সরকারি কোষাগারে টান পড়ে না। গত ৯ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে করপোরেট পুঁজিপতিদের যেখানে ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৭২ হাজার ৮৮১ কোটি টাকা, সেখানে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে তা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা। ফলে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, এই সরকার কাদের স্বার্থ দেখছে।

মূল্যবৃদ্ধির আগুনে সাধারণ মানুষ পুড়ছে, চাষিরা, বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা হাজারে হাজারে আত্মহত্যা করছে, বেকার যুবক-যুবতীরা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে, বেকারত্বের জ্বালা ভুলতে নেশাগ্রস্ত হচ্ছে, ঘরের মা-বোনেরা সন্ধ্যার অন্ধকারে দেহ বিক্রির বাজারে বিকিয়ে যাচ্ছে, সে দিকে মোদির কোনও দৃষ্টি নেই। নির্বাচনে তাঁদেরই ভোটে জিততে হলেও মোদিরা মনে করেন, পুঁজিপতিদের টাকার থলি আর প্রচারমাধ্যম সাথে থাকলে তারা জিতবেনই। তাই পুঁজিপতিদের সেবাই তাঁরা একমাত্র ধ্যানজ্ঞানে পরিণত করেছেন। পুঁজিপতিরাও মোদিকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছে। অন্য দিকে মোদির এক বছরের শাসনে সাধারণ মানুষের কাছে 'আচ্ছে দিন' কথাটি নির্মম পরিহাসে পরিণত হয়েছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার অবিরাম চর্চা এবং তার সঠিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করুন

২৪ এপ্রিল গুয়াহাটির জনসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

দলের ৬৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল আয়োজিত গুয়াহাটির জনসভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টির আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস। তিনি উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের সর্বনাশা কার্যকলাপের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। মার্কসবাদী আদর্শকে আত্মস্থ করে এই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের নির্মূল করার আহ্বান জানিয়ে তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

প্রধান বক্তা দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা আমাদের কাছে আনুষ্ঠানিকতার বিষয় নয়। আমাদের উপর ঐতিহাসিকভাবে যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা দ্রুত এবং যথাযথভাবে পালন করার জন্য সমবেতভাবে নতুন করে সংকল্প গ্রহণ করাই এর মূল তাৎপর্য। এই দিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সর্বশেষ সঠিক মূল্যায়ন, দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দলের রাজনীতি ও রণকৌশলের যথার্থতা তুলে ধরা, এই পথে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরান্বিত করা এবং এই উদ্দেশ্যে নিজেদের সবটুকু বিপ্লবের কাজে সমর্পণ করার সংকল্প গ্রহণ করাও এই দিবস পালনের আর একটি অপরিহার্য উদ্দেশ্য।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সর্বশেষ পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তুলে ধরে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, সারা বিশ্বই আজ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে। বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট তীব্র সংকটের মূলে যে পুঁজিবাদ, এই সত্য একটি মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না। বিভিন্ন দেশে প্রতিদিন এই সংকটের প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন ভাবে। ইরাক, ইরান, লিবিয়া সহ সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে সামরিক যুদ্ধ স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে, তার ধ্বংসাত্মক পরিণাম হাজার লক্ষ মানুষকে পিষে মারছে। আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যা ঘটে চলেছে সেটাও কম ধ্বংসাত্মক নয়। সংকটে পড়ে মানুষ বেঁচে থাকার পথ খুঁজে না পেয়ে পুঁজিপতিদের প্ররোচনায় এক জনগোষ্ঠী আর একটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী রক্তাক্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে, আর না হয় আত্মহননের কথাই চিন্তা করছে এবং এই সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কোনও দেশেই জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ বলে ঢালাও প্রচার চলে। কিন্তু এই সংকট থেকে সেখানকার জনসাধারণেরও পরিত্রাণ নেই। আজ তাদেরও ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সম্প্রতি আমেরিকার অর্থনীতিতে যে সাবপ্রাইম ক্রাইসিস দেখা দিল এবং তার থেকে আরও মারাত্মক ধরনের সংকট জন্ম নিল— এক কথায় তা নজিরবিহীন। সংকট কাটিয়ে ওঠার কোনও পথ না পেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার যুদ্ধের দিকে ঝুঁকছে, সারা বিশ্বে যুদ্ধকে উস্কানি দিচ্ছে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমেরিকার জনসাধারণ আজ এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে, ক্ষোভের তীব্রতা এমনই যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা আর তাদের ইচ্ছা জনগণকে দিয়ে মানিয়ে নিতে পারছে না। ধার আর ধার, তা বাদ দিয়ে এক দিনও চলে না— the greatest debtor nation (সর্বাধিক ঋণগ্রস্ত দেশ)— এটাই আজ আমেরিকার পরিচয়। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, লেবানন ছাড়াও আরও বহু দেশ তার শিকার হয়েছে। এই সবের পরিণামে আমেরিকার অর্থনীতিও মন্দার আঘাতে টলমল করছে। অতীতের ইউরোপের ঐশ্বর্য সম্পর্কে আপনাদের অনেকেই অনেক কাহিনি শুনেছেন। কিন্তু সেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ— গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস কোথাও অর্থনীতি সংকটমুক্ত নয়। সে সব দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটছে। বাজার সংকটে পড়ে পুঁজিপতিরা জনসাধারণের উপর আক্রমণ যত তীব্র করছে, জনগণের ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রতিদিন ততই ফেটে পড়ছে। সে সব দেশের সরকার তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। জনগণের তীব্র ক্ষোভের মুখে সরকার তার কার্যকাল সম্পূর্ণ করতে পারছে না। গণবিক্ষোভ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে এটা ওটা রিলিফ দিতে চাইলে পুঁজিপতি শ্রেণি তাও করতে দিচ্ছে না। গণবিক্ষোভের মুখে বহু দেশেই গোটা সরকারকে পদত্যাগ করতে হচ্ছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পুঁজিপতি শ্রেণির অস্তিত্ব বিপন্ন করে দিতে পারে এমন সম্ভাবনা যাতে সৃষ্টি না হয়, আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে পুঁজিপতিরাও চক্রান্ত করে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে ঘন ঘন নির্বাচনের জালে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অর্থনৈতিক সংকটের যে কারণে শাসকদল ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারছে না, ক্ষমতাসীন সরকারকে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করাচ্ছে, সেটাই আবার সে সব নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে। ফলে পুঁজিপতি শ্রেণির একটা দলের জায়গায় আরেকটা নতুন দল আসছে, সেও আবার সংকটে পড়ছে আর তখনই আরেকটা নির্বাচন সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গোটা ইউরোপে পুঁজিপতি শ্রেণি এই খেলাটাই খেলছে। তাদের হাতে রয়েছে অসংখ্য গোলাম রাজনৈতিক দল। তাই এক দলের পরিবর্তে আরেকটা দলকে ক্ষমতায় বসাতে কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না।

বিরাজমান পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে আগ্রাসী পুঁজিবাদই আজ পৃথিবীর ছোট বড় সব দেশেই সংকটের শিকড়কে অনেক গভীরে নিয়ে গেছে, যা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ জনসাধারণ আজ খুঁজে পাচ্ছে না। একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণির নির্মম, নিষ্ঠুর অবাধ শোষণ, কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বেরিয়ে আসা জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশ— আরেক দিকে জনসংখ্যার ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষের মৃতপ্রায় জীবন ধারণ— এটাই তো গোটা বিশ্বের বাস্তব চিত্র, যা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারও নেই। যে সব দল ও যে সব ভাড়াটে পণ্ডিত পুঁজিবাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য নিযুক্ত, তাদেরও নেই।

ভারতবর্ষের অবস্থাও মূলত একই, বিশেষ তারতম্য নেই। বস্তুত পুঁজিপতি শ্রেণির ৬৮ বছরের বর্বর শোষণের ফলে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ আজ দারিদ্র সীমার নিচে। ৭৭ ভাগ মানুষের দৈনিক খরচ করার ক্ষমতা ২০ টাকার চেয়েও কম। মানুষ বেঁচে থাকার পথ পাচ্ছে না। এই সেদিন রাজধানী দিল্লিতে গাছে উঠে কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা কী নির্দেশ করে? এটা তো একটা মাত্র ঘটনা। প্রতিদিন বহু জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। চড়া সুদে ঋণ নিয়ে অনন্যোপায় হয়ে কৃষকরা চাষ আবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। ফলে ঋণ শোধ করার আর কোনও পথ না পেয়ে লাখ লাখ কৃষক আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হচ্ছেন। নতুন কলকারখানা দূরে থাকুক যেগুলো টিমটিম করে হলেও চলছিল সেগুলো একটার পর একটা বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা যাচ্ছে। এই যে বর্বরোচিত নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ পৃথিবীর সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, ১০ /১৫ বছর আগে তা আজকের মতো ছিল না। ঘরের বাইরে গেলে যে কোনও মুহূর্তে এই বিপদের সম্মুখীন হবেন না, এমন কথা আজ কোনও মহিলাই বলতে পারেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁদের ঘরে বসে থাকার উপায় নাই। সন্তানের খাবার নেই, অর্থ নেই, সম্পদ নেই। জীবিকার প্রয়োজনে জীবন বিপন্ন করেও তাঁদের বাইরে যেতে হচ্ছে এবং তার খেসারতও দিতে হচ্ছে। আর শুধু বাইরে গেলেই নয়, ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থেকেও তাঁরা আজ নিরাপদ নন। কিন্তু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটা লক্ষ করুন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর কোনও হেলদোল নাই, সরকার তা যে দলেরই হোক না কেন তাদের কোনও চিন্তা নেই, তারা নির্বিকার। হাজার হাজার হতদরিদ্র মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে না পেরে আত্মহত্যা করছে আর পুঁজিপতি শ্রেণি ও তার সরকার বলছে হতে দাও, কিছুটা ক্ষতিপূরণ দিয়েই অবস্থা সামাল দেওয়া যাবে। মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ! এটা উচ্চারিত হয় কীভাবে? তাহলে দেখুন, পুঁজিবাদের সৃষ্টি করা এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে একজন ব্যক্তিরও রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায় নেই। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এই সত্যকে নতুন করে আবার উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

পুঁজিবাদ সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত অধঃপতন নামিয়ে এনেছে সে সম্পর্কে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, মহান কার্ল মার্কস ১৮৪৮ সালেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, পুঁজিবাদ মানুষকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে তাই নয়, সমস্ত ধরনের মানবিক সম্পর্কগুলিকেও কেবল টাকার সম্পর্কে অধঃপতিত করে। বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই তা দিনের আলোর মতো প্রতিভাত হয়েছে। কোনও পরিবারেই আজ আর শান্তি নেই। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী সমস্ত সম্পর্কই আজ টাকার সম্পর্কে অধঃপতিত হয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের, বোনের প্রতি ভাইয়ের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। পিতা নিজের কন্যাকে ধর্ষণ করছে। মনুষ্যত্বের আর কত অধঃপতন আমাদের দেখতে হবে! প্রশ্ন উঠে গেছে, দিল্লিতে কেজরিওয়াল জনসভা করছেন আর মিটিং চলা অবস্থায় গাছে উঠে একজন দরিদ্র লোক আত্মহত্যা করছে। কিন্তু মিটিং বন্ধ করে দেওয়ার ন্যূনতম মানবিক অনুভূতিও দেখা গেল না। এই লোকটাকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ তো নয়ই, উপস্থিত মানুষগুলোর কারও মনেও সামান্যতম চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়নি। এর চেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কী হতে পারে! মনুষ্যত্ববোধের কতটা অবনমন ঘটলে এরকম ঘটতে পারে। আমি জনসাধারণকে দোষারোপ করছি না, ধরাবার চেষ্টা করছি এর মূল কারণ কী? কার্ল মার্কস থেকে শুরু করে মহান এঙ্গেলস, মহান লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং, কমরেড শিবদাস ঘোষ সকলেই এর মূল কারণ নির্ধারণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পুঁজিবাদই সমগ্র মানব জাতির প্রধান শত্রু, এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, একদিকে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট আর অন্যদিকে নীতি নৈতিকতা, মনুষ্যত্ববোধের এই চূড়ান্ত অধঃপতন। এর প্রতিবিধান কী? এই শ্বাসরোধকারী অবস্থায় প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই জগদ্দল পাথরের মতো বসে থাকা পুঁজিবাদকে নির্মূল করার সংকল্প নেওয়ার বাইরে আর কোনও বিকল্প নেই। পুঁজিবাদ শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার করে মানুষকে নিঃশেষ করে দেবে আর শোষিত মানুষ বসে বসে তা উপভোগ করবে, তা হয় না। জনগণের ক্ষোভ কিছু দিন অন্তর ফেটে পড়বেই, আর সঠিক নেতৃত্ব না থাকলে তার পরিণাম ধ্বংসাত্মক হবে। জনগণ আরও গভীর সংকটের আবর্তে পড়বে। পুঁজিপতি শ্রেণি আর শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে কোনও বোঝাপড়া চলতে পারে না। হয়, শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিবাদকে নির্মূল করবে, না হলে শোষিত জনসাধারণকে পোকামাকড়ের মতোই মরতে হবে। ফলে যারা আজও জনসাধারণের জন্য কিছু করার কথা চিন্তা করেন তাঁদের এই সত্যকে অগ্রাহ্য করে, পুঁজিবাদকে অগ্রাহ্য করে জনগণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করা অর্থহীন। বহুদিন আগেই মহান কার্ল মার্কস শোষিত নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তির জন্য ভণ্ডামি ও প্রতারণামূলক পথের খপ্পরে না পড়ে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের জন্য প্রতিটি দেশে শোষিত শ্রেণির নিজস্ব দল অর্থাৎ প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। একমাত্র ৯০/৯৫ ভাগ বিপন্ন শোষিত মানুষ শ্রমিক শ্রেণির চেতনা পেলেই পুঁজিবাদের নিদ্রাহীন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। লক্ষণীয় যে, এই পরিস্থিতি আটকাবার জন্য সমস্ত দেশেই আজ পুঁজিবাদ বিভিন্ন চক্রান্তের জাল বুনছে। লেনিন বলেছিলেন, পুঁজিবাদের এই ক্ষয়িষ্ণু যুগে পুঁজিপতিদের তার দেশের জনসাধারণকে ভালো কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষকে আঘাত করার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে। তাই দেখুন, আজ প্রতিটি দেশেই কামান কিংবা গুলি চালিয়েই হোক, খেতে না দিয়েই হোক বা যে কোনও প্রকারেই হোক লক্ষ লক্ষ মানুষকে পিষে মারতে পুঁজিপতিরা এবং তাদের ভাড়াটিয়া সরকারগুলি কুণ্ঠাবোধ করছে না। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা

সাতের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল গুয়াহাটির জনসভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

ছয়ের পাতার পর

স্বাস্থ্য সব কিছু কেড়ে নিয়ে মানুষকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করছে। আর জনগণের ফুঁসে ওঠা বিক্ষোভ যাতে পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে পরিচালিত না হয়ে বিপথগামী হয় তার জন্য যত প্রকারে সম্ভব মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। একটা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরেকটা গোষ্ঠীকে লাগিয়ে দিচ্ছে। নীতি, নৈতিকতা, আদর্শের ভগ্নাংশ যতটুকু এখনও টিকে আছে তাকেও ধ্বংস করার জন্য শত সহস্র চক্রান্তের জাল বুনছে। জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদির নামে মানুষকে বিভাজিত করে চলছে। অন্যদিকে তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য টাকা-পয়সা, প্রচার সমস্ত দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে জনসাধারণকে তথাকথিত ভোটের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা করছে। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে প্রায় দুশো বছর আগে নির্বাচনের ধারণা এসেছে। কিন্তু প্রতিটি দেশে যত নির্বাচন হচ্ছে ততই ৯০ ভাগ মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। তাহলে মূল কথাটা হচ্ছে ভোটের মাধ্যমে একটা দেশে সরকারের পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তন এবং তার উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অসম্ভব। পুঁজিবাদকে ভোটের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা যায় না। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকারের পরিবর্তন হলেও পুঁজিবাদের শাসন শোষণ অটুট থাকবে, রাষ্ট্রযন্ত্র অক্ষত থাকবে, মালিক-মজুর উৎপাদন সম্পর্ক অটুট থাকবে। তাই এই অবস্থায় ভোটের মাধ্যমে এই দুঃসহ অবস্থার উপশম ঘটবে, দারিদ্র দূরীভূত হবে, শোষিত মানুষের জীবনে নতুন আলো আসবে এরকম ভাবার অর্থ হচ্ছে আরও বেশি করে পাঁকের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া।

সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদের এই দৌরাত্ম্যের প্রতিবিধানের পথ উল্লেখ করে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, মার্কসের চিন্তার মধ্যেই নিহিত আছে এই অবস্থার প্রতিবিধান। এই মহাসত্যকে অনুধাবন করে দেশে দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা, পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা, তাদের চেতনা বৃদ্ধি করা, গণআন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত করে অত্যাচারিত শোষিত জনসাধারণকে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করা— এটাই হচ্ছে সময়ের দাবি।

কিন্তু ট্র্যাজিক দিকটি হল, কমিউনিস্ট আন্দোলন উপযুক্ত তত্ত্বগত উপলব্ধি নিয়ে আজ অনুপস্থিত। সাময়িকভাবে হলেও আধুনিক শোধনবাদের খপ্পরে পড়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ তার ব্যাপকতা, গতিশীলতা এবং ক্রিয়াশীলতা হারিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত আদর্শগত মান, সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার লেনিন বর্ণিত মূল নীতিগুলো, যাকে পরবর্তীকালে কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের মাটিতে আরও সম্প্রসারিত এবং বিশেষীকৃত রূপে তুলে ধরে মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে গেছেন, সেই দিকটা ব্যাখ্যা করে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, মার্কসবাদ- লেনিনবাদের শিক্ষা হচ্ছে, যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে অগ্রণী হবেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে, এমনকী যৌনজীবন সহ জীবনের ব্যক্তিগত সমস্ত দিককে জড়িত করে একটি সর্বব্যাপক socialist movement -এ (সমাজতান্ত্রিক আদর্শগত সংগ্রামে) সামিল হতে হবে। কঠোর সংগ্রামের ভিত্তিতে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের বুনিয়াদ স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দলের অভ্যন্তরে সম চিন্তাপদ্ধতি, সম চিন্তা, সম বিচারধারা ও সম উদ্দেশ্যমুখিনতা গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অথচ এ কাজ সম্পূর্ণ না করে একটা কমিউনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেওয়া যেতে পারে না। তৃতীয়ত, দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক দল প্রফেশনাল বিপ্লবীর জন্ম দিতে হবে, যাঁরা কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম দেবেন, যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, সুবিধা অসুবিধা সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনসংগ্রামে সারাক্ষণ লিপ্ত থাকার মধ্য দিয়ে উন্নততর তাত্ত্বিক উপলব্ধির অধিকারী হবেন। প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পূর্বে এই অবশ্যকরণীয় কাজগুলো না করে একটা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা বাস্তব সত্য যে অবিভক্ত সিপিআই দলটি এবং আজকের সিপিআই-এম এবং বিভিন্ন ধারার নকশালপন্থীরা এর ধারে কাছেও যেতে পারেনি। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের এই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির কোনও পরোয়া না করে দল গঠন করার পরিণাম যা হওয়ার তাই হয়েছে। এই সিপিআই এবং সিপিআই(এম) এবং প্রাক্তন নকশালবাদীদের অবস্থা আজ এমনই যে পুঁজিপতিদের অতি বিশ্বস্ত, তাদের নয়নের মণি কংগ্রেসের ঘরে আশ্রয় নিতেও তারা দ্বিধা করছে না।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, কমিউনিজম নিছক একটা স্লোগান নয়, একটা জীবনদর্শন। বিপ্লবের সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত দিক— ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ ও তার থেকে উদ্ভূত মানসিক চারিত্রিক জটিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সম্পর্কে সঠিক বিপ্লবী ধারণা—এই সব কিছুকে যুক্ত করে সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং এর মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ রেখে নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করার সংগ্রাম করতে না পারলে প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। আর মার্কসবাদের এই উপলব্ধির ভিত্তিতে প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে না পারলে আজকের দিনে জনসাধারণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করাও আদৌ সম্ভব হবে না। ফলে আজকের এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গেলে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন একজন বিপ্লবী কর্মীকে তার তত্ত্বজ্ঞানকে আরও উন্নত, আরও গভীরতর করতে হবে এবং সার্থকতার সঙ্গে তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিপ্লব, বিপ্লবী দল ও বিপ্লবী নেতৃত্বের সাথে নিজেকে একীভূত করতে হবে। এটাই ইতিহাস নির্ধারিত পথ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কোথায়? মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিষয়টাকেই ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন, বিপ্লবী জীবন কীরকম হবে বুঝিয়ে দেওয়ার সংগ্রাম করে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের এই সমস্ত শিক্ষাকে বুকে বহন করে জনগণের আপন হয়ে উঠতে হবে, দলের কার্য-কলাপ সম্প্রসারিত করতে হবে। দলের চিন্তা ভাবনাকে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন এই ভাবেই সম্ভব হয়ে উঠবে। ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলে, এবং পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী ভাবনা চিন্তার শিকড় যা অজ্ঞাতসারে হলেও বিভিন্ন কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে নিজ নিজ চেষ্টার মধ্য দিয়ে সেগুলোকে নির্মূল করতে পারলে আর এই পথেই, সমাজে শোষিত জনসাধারণকে উন্নত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এবং বিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠবে।

আসামে বিরাজমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, অন্যান্য রাজ্যের জনসাধারণ পুঁজিবাদ সৃষ্ট যেসব সমস্যায় আজ শ্বাসরুদ্ধ, আসামের জনসাধারণের জীবন ধারণের ক্ষেত্রেও তার কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। পুঁজিবাদের শোষণ-নির্যাতনের চরিত্র বিহার, গুজরাট, তামিলনাড়ু বা ওড়িশায় যা, আসামেও তাই। কিন্তু তার সাথে আসামের যে বিশেষ সমস্যা তা হচ্ছে, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, বিভাজনবাদী শক্তিগুলোর দাপট। দীর্ঘদিন থেকে এই সমস্যা আসামের সমাজজীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধ আন্দোলন না থাকায়, উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তি নতুন করে আরও শক্তি বৃদ্ধি করছে এবং এর মধ্য দিয়ে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির জনগণের জীবন বিষাক্ত করে তুলেছে। সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জি প্রণয়ন এবং 'অসমীয়া'র সংজ্ঞা নির্ধারণের ধুয়া তুলে এবং এ ধরনের হাজার একটা উদ্ভট কিন্তু নিঃসন্দেহে দুরভিসন্ধিপ্রসূত চিন্তা ভাবনা ছড়িয়ে দিয়ে, রাজ্যে আজ এক অতি বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১০ সালে বরপেটা জেলায় তথাকথিত নাগরিকপঞ্জির কাজ শুরু করার সময়েই আমরা বলেছিলাম, এ হচ্ছে রাজ্যের ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের নাগরিকত্ব হরণ করার আরেকটি অতি উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী চক্রান্ত। আপনাদের অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, এই জঘন্য জাতিবিদ্বেষ সৃষ্টিকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বরপেটা জেলায় আমরা তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। আমরা ছাড়া বাকি সমস্ত দল কংগ্রেস, বিজেপি, এজিপি, ইউ ডি এফ এমনকী বামপন্থী মার্কসবাদী বলে নিজেদের জাহির করে যে সিপিআই, সিপিআই(এম), তারাও তথাকথিত নাগরিকপঞ্জি প্রণয়নের পক্ষে মত দিয়েছে কেবল তাই নয়, নাগরিকপঞ্জি হয়ে গেলে জাতিবিদ্বেষপ্রসূত সমস্ত সমস্যার প্রতিকার হয়ে যাবে এই মিথ্যা প্রচারও করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই তথাকথিত নাগরিকপঞ্জি প্রণয়নের প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য সেদিন জনসাধারণকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিল। অবশেষে আন্দোলনের চাপে নাগরিকপঞ্জি প্রণয়নের যে প্রয়াস সরকার হাতে নিয়েছিল তা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এবার সমগ্র রাজ্যে একই সাথে আবার নতুন করে এই চক্রান্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তিগুলি আটঘাট বেঁধে আরও শক্তি সঞ্চয় করে নিশ্চিতভাবে ভারতের নাগরিক ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনে আরও হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে আনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। 'আসু'র জঘন্য দাবিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রশ্নে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সব একাকার। এমনকী জুডিসিয়ারি পর্যন্ত ওদের প্রতি ভীষণভাবে সহানুভূতিশীল। যে কোনও প্রকারে নাগরিকপঞ্জি প্রণয়ন করতেই হবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করতে পারছে না যে, ১৯৫১ সনের নাগরিকপঞ্জি ও ১৯৭১ সনের আগের ভোটার তালিকা অস্তিত্বহীন। তাহলে এই অস্তিত্বহীন ডকুমেন্টকে ভিত্তি করে নাগরিকপঞ্জির উন্নতিকরণ কীভাবে সম্ভব? আন্দোলনের চাপে পড়ে, গণবিক্ষোভের আঁচ পেয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কয়েকটা সাপ্লিমেন্টারি ডকুমেন্টের কথা বলেছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, আসামে বিভিন্ন সময় দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, বন্যা, নদী ভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য বহু প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক সেসব দেখাতে পারবেন না। ১৯৭১ সনের আগে এইসব ডকুমেন্ট হতদরিদ্র গরিব মানুষেরা সংগ্রহ করার প্রয়োজনও অনুভব করেনি। ফলে যে সমস্ত ডকুমেন্ট সরকার ঘোষণা করেছে তা দুরভিসন্ধিমূলক ভাবে করেছে, যাতে সংখ্যালঘু গরিব মানুষেরা প্রামাণ্য কোনও নথিপত্র দেখাতে না পেরে এই চক্রান্তের শিকার হয়ে নাগরিকত্বহীন হয়ে যান। প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকের একজনেরও নাম যাতে নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ না পড়ে তা সুনিশ্চিত করার ইচ্ছা থাকলে আমাদের দাবি মতে, যে কোনও প্রামাণ্য দলিলকেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু সরকার তা করেনি। তাছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের বা জুরিসপ্রুডেন্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধার হচ্ছে সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় নির্ধারণের প্রশ্নে পারিপার্শ্বিক অবস্থারও একটি নির্ণায়ক ভূমিকা রয়েছে। চক্রান্তকারীরা তো বটেই সুপ্রিম কোর্ট ও সরকার উভয়েই এটা মানতে নারাজ। এমনকী জন্মসূত্রে অটোমেটিক নাগরিকত্বের যে আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে এই নাগরিকপঞ্জি প্রস্তুত করতে গিয়ে, সরকার সেটাও মানছে না। তাহলে এটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার যে এই নাগরিকপঞ্জি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট দুরভিসন্ধি কাজ করছে। নাগরিকত্বহীনতা মৃত্যুর সমতুল্য। ইতিমধ্যে রাজ্যের ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে মারাত্মক ধরনের আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বিগত ৩০/৪০ বছর ধরে সংখ্যালঘু মানুষেরা নানা ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। লাখ লাখ মানুষকে চক্রান্ত করে নাগরিকত্বহীন, রাষ্ট্রহীন করলে তার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর হবে সেটা সকলকেই বুঝতে হবে। অনৈক্য, অশান্তি, বিদ্বেষ, হিংসার আগুন কাউকে শান্তি দেবে না। এই বিষয়টা অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'-এর মতো উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা আরেকটা আক্রমণ শুরু করছে। অসমীয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের উদ্ভট চিন্তা অন্য কোথাও, অন্য কোনও রাজ্যে এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। একটা জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দেওয়াটা তো ইতিহাস বিরুদ্ধ চিন্তা। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন, মানবসমাজের ক্রমবিকাশের মূল ধারা হচ্ছে প্রসেস অফ অ্যাসিমিলেশন এবং প্রসেস অফ ইউনিফিকেশন এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আদিম ক্ল্যান থেকে ট্রাইব এসেছে, ট্রাইবগুলোর ইন্টিগ্রেশন-এর মধ্য দিয়ে ন্যাশনালিটিস বা উপজাতির আবির্ভাব হয়েছে এবং উপজাতিগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে একটা জাতি এবং জাতীয় রাষ্ট্রের (নেশন স্টেট) উদ্ভব হয়েছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়ে উন্নত জীবন যাপন ডিসইন্টিগ্রেশনের মধ্যে সম্ভব নয়, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন সেখান থেকেই দেখা দিয়েছে। মার্কসবাদে 'বিকাশের পথে অবলুপ্তি, অবলুপ্তির পথে বিকাশ'-এর তত্ত্ব বলছে যে, একদিন আজকের জাতিও থাকবে না। ইতিহাসের নিয়মেই বিশ্ব-মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে নায়িকার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'নাই বা থাকল আমার ভারতীয় পরিচয়, আমি বিশ্ব

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

বিধানসভায় কমরেড তরুণ নস্কর

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট প্রসঙ্গে

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেটের বিরোধিতা করে ২২ মে বিধানসভায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিধায়ক অধ্যাপক ডঃ তরুণ নস্কর বলেন, বাজেটের উপর মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত ভাষণ পড়ে আমার যা বলতে ইচ্ছে করছে তা হল, জাস্টিস মোল্লা বলেছিলেন, পুলিশ হচ্ছে সবচেয়ে সংগঠিত ক্রিমিনাল বাহিনী। অথচ, এই দপ্তরের বাজেটে যা আসলে পুলিশ বাজেট তাতে পুলিশকে প্রচুর বাহবা দেওয়া হয়েছে। পুলিশের থানাগুলো এক শাসক দলের নিয়ন্ত্রণ থেকে আর এক শাসক দলের দখলে চলে গেছে। যদি কোনও অফিসার মেরুদণ্ড সোজা রাখতে চান, তাঁর ভবিষ্যৎ কী হয়, পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডে তা আমরা দেখেছি। আর শাসক দলের আক্রমণে টেবিলের তলায় যাঁরা লুকান, তাঁরা প্রশ্রয় পান। নেতাইয়ের গণহত্যায় যে অফিসারকে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে শুনেছিলাম, তাঁর আজ পদোন্নতি হয়েছে। নন্দীগ্রামের অভিযুক্ত অফিসারদেরও শাস্তি হয়নি, প্রোমোশন হয়েছে।

পুলিশকে দিয়ে কী না করানো হচ্ছে? মিনিকিট, মুরগির ছানা, ছাগল ছানা, বাছুর বিতরণ, ফুটবল টুর্নামেন্ট, এমনকী মডেল স্কুল খোলানো পর্যন্ত। এগুলো কি পুলিশের কাজ? পুলিশ যদি এগুলো করতে থাকে, দুষ্কৃতী ধরবে কে? মানুষকে নিরাপত্তা দেবে কে? সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিরই বা কী কাজ থাকবে?

প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে অগণিত খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, শিশু-নারীপাচারের ঘটনা বেরোচ্ছে। অথচ লিখিত ভাষণে বলা হয়েছে, ২০১৪-১৫ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের পরিমাণ রাজ্যে মোটামুটি সন্তোষজনক। এই 'সন্তোষজনক' শব্দটি অত্যন্ত আপত্তিজনক। কোনও কারণেই কি বলা যায়, অপরাধের পরিমাণ সন্তোষজনক? আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই শব্দটি প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

অপরাধের কেসের সংখ্যা তো কমবেই। শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের চাপে পুলিশ কি কেস নেয়? প্রায়ই নেতা-মন্ত্রীদের বলতে শুনি, পুলিশকে এই বলেছি, ওই বলেছি। কোন অধিকারে এসব বলেন তাঁরা? তাঁরাই যদি এত কথা বলেন, তা হলে পুলিশমন্ত্রীর কাজ কী? আসলে সব সরকারই চায় অনুগত পুলিশবাহিনী। গতকালই সংবাদমাধ্যমে দেখছিলাম, সাতোরে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা প্রকাশ্য দিবালোকে সাংবাদিককে বলছে, 'আবার এখানে এলে ঠ্যাং ভেঙে দেব, হাত কেটে নেব'। পুলিশ কিন্তু চুপ। সেই নেতা নাকি অন্য কেসে ফেরার! কিছু কিছু জেলা অস্ত্রভাণ্ডারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। রাজ্যে এই পরিস্থিতিই চলছে।

বলা হচ্ছে, কত নাকি নতুন থানা খুলেছে, মহিলা থানা খুলেছে! সরকার নতুন লোক কতজন নিয়েছে তা কিন্তু বলা নেই। থানাগুলো চলবে কী করে? পুলিশ নিজে চুরি ডাকাতি ছিনতাই তোলাবাজি ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত — একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছে। আর তাদের জন্য কত সুযোগ সুবিধা! আসলে এদের উপর নির্ভর করে প্রশাসনে দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েমের চেষ্টা চলে, তাই এদের এত সুবিধা পাইয়ে দেওয়া। সিভিক পুলিশ সিভিক ভলান্টিয়ার্সে পরিণত হয়েছে, তাদের ডিউটি দেওয়া হয় না, উল্টে কাজ চাইলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের স্থায়ী করা হচ্ছে না কেন?

আমি এই বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করছি।

ডেন্টাল সার্ভিস সংশোধনী বিল

দলীয় নিয়ন্ত্রণ পাকা করতে চাইছে সরকার

বিধানসভায় ডেন্টাল সার্ভিস সংশোধনী বিল সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নিয়ে ১৯ মে অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বদলে হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে নিয়োগ করতে চাইছে তাতে স্বচ্ছতার অভাব আছে। ১৯২৬ সালে তৈরি হওয়া স্বশাসিত পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই সরকারের তৈরি বোর্ডের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ। সরকার নিজের তৈরি এই বোর্ডকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই সরাসরি নিয়োগ করতে চাইছে যাতে দলীয় নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত হয়। এতে দুর্নীতি আরও বাড়বে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কেমন 'স্বচ্ছ' তা বোঝা গেছে টেটের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি দেখে।

ডেন্টাল সার্ভিসের ডাক্তারদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের মেয়াদ ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করার বিরোধিতা করেন অধ্যাপক তরুণ নস্কর। তিনি এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এই বিল আসলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দলতন্ত্র কায়েম করার জন্যই তৈরি।

সরকারি উদ্যোগে ফসল কেনার দাবিতে
কেন্দ্রের জনবিরোধী জমি অধিগ্রহণ বিলের প্রতিবাদে
১৬ জুন কলকাতায়
এ আই কে কে এম এস-এর ডাকে
কৃষক বিক্ষোভ

প্রবীণ কৃষক নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত হৃদরোগে আক্রান্ত

এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৪ মে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রবোধ পুরকাইত (৭৯) দীর্ঘদিন ধরেই নানা রোগে অসুস্থ। প্যারোলে 'মুক্ত' থাকা অবস্থায় গতকাল রাতে তিনি হঠাৎ হৃদরোগে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হন। রাতেই তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করতে হয়। তিনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আছেন।

নৃশংস ধর্ষণের পরিণতিতে ৪২ বছর ধরে জীবন্মৃত নার্সিং স্টাফ অরুণা শানবাগের মৃত্যুতে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে ২০ মে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি শোকমিছিল সভাস্থল থেকে যাত্রা শুরু করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অশোক সামন্ত, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, সিস্টার প্রীতি তারণ, কমিটির সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত প্রমুখ।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

সাতের পাতার পর

মানবজাতির একজন, তার গৌরবই কি কম?' স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আসামের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ আসাম অ্যাসোসিয়েশনকে কংগ্রেসের সাথে মার্জ করে অর্থাৎ মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই পথেই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে তাঁরা একাত্ম হয়েছেন। আসাম সহ সমস্ত ভারতবর্ষেই একটা ভারতীয় বোধের ভিত্তিতেই স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। সেদিন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, নবীনচন্দ্র বরদলৈ, গোপীনাথ বরদলৈ, তরুণরাম ফুকন প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিরা তো অসমীয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার কথা বলেননি। তাহলে দেখুন, সংকীর্ণ স্বার্থ পূরণের জন্য ইতিহাসকে পায়ে মাড়িয়ে ইতিহাসবিরুদ্ধ পথে গিয়ে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা অস্তিত্ব রক্ষার নামে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে। উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা যখনই অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলেছে তখনই আমরা বলেছি, অস্তিত্বের প্রশ্ন অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত। অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে অস্তিত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ ৯০ ভাগ মানুষের অবস্থান কোথায়? শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষিত জনসাধারণের কেউ কখনও কারও অস্তিত্ব বিপন্ন করে না। ভাষা সংস্কৃতির প্রশ্নেও একই কথা। শ্রমজীবী জনসাধারণ যেখানেই থাকুন না কেন তাঁরা সম্পদ সৃষ্টি করেন, কেউ কাউকে শোষণ করেন না। শোষণ করে শোষক, বর্তমান অবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণি। স্বাধীনতার ৬৮ বছরে ভাষা, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ৯০ ভাগ শোষিত মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে পুঁজিপতি শ্রেণি। অথচ উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীরা পুঁজিবাদকে আড়াল করে শোষিত মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চক্রান্ত রচনা করে চলেছে। উগ্র প্রাদেশিকতাবাদীদের এই সমস্ত চিন্তা পুঁজিপতি শ্রেণিরই চিন্তা। এই সমস্ত চিন্তা আজ আসামে জনসাধারণের ঐক্যকে মারাত্মকভাবে আঘাত করছে। খণ্ড চিন্তা, পৃথকতাবাদী চিন্তা, বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা পরোক্ষভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির শাসন শোষণকেই টিকে থাকতে সাহায্য করে। আসামে আজ রক্তাক্ত ঘটনাবলি যেভাবে এগোচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষে যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের রক্তাক্ত বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, তেমন একটি অতি নিকৃষ্ট বিভাজনবাদী অবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে। বার বার খণ্ডিত আসামে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে যে শেষ পর্যন্ত আসামের ভৌগোলিক অবস্থা আরও বিপন্ন হয়ে উঠবে। আরও মনে রাখতে হবে, একটা অবস্থায় আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের জন্ম দেবে। আসামে আবার রক্তগঙ্গা বইবে। আসামে ভাঙন আবার অনিবার্য হয়ে উঠবে। সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে আক্রান্ত মানুষকে নেতৃত্ব দিতে না পারলে আসাম ভূমি বর্তমানের চেয়ে আরও মারাত্মক একটি বধ্যভূমিতে পরিণত হবে। গোটা রাজ্যের অস্তিত্বই মারাত্মক ভাবে বিপদাপন্ন হয়ে উঠবে। রাজ্যের এই মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য আমাদের দল ছাড়া অন্য কেউ নেই। ফলে দলের চিন্তাভাবনা, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। এই সর্বনাশা চিন্তাকে নির্মূল করতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -কে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucic.in